একজন এমিলির গল্প
খন্দকার জাহিদ হাসান

খুব ভোরে এমিলির ঘুম ভাঙ্গলো। এখন জুনের মাঝামাঝি সময়। অস্ট্রেলিয়ায় এই মাস থেকেই শীতকাল শুরু হয়। কদিন হল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু করে বৃষ্টিও হচ্ছে প্রতিদিন। তবু এই ঠাণ্ডা তেমন কিছুই না- ভাবল এমিলি। সে যখন ছোটো ছিল, এর চাইতে অনেক বেশী ঠাণ্ডা পড়ত তখন। বৃষ্টিও কি কম হত! তখন সে তার বাবা-মা আর ছোট দুই ভাইয়ের সাথে ব্রোকেন হিলে থাকত। তার স্পষ্ট মনে আছে, একটানা তিন চার দিন, আবার কখনোবা এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টিপাত চলত। সেই তুলনায় অস্ট্রেলিয়াতে এখন আর তেমন বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। এখনকার লোকজনের ধৈর্যও অনেক কমে গেছে। সামান্য বৃষ্টি দেখলেই মানুষ এখন গজর গজর করতে শুরু করে, "হোয়াট এ টেরিব্‌ল ওয়েদার! আই হেইট রেইন!"- ইত্যাদি। এই রিভারস্টোনে যারা বহু দিন ধরে বাস করছে, তাদের কারো কারো কাছে এমিলি শুনেছে যে, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে নাকি সারা সিটি কাউন্সিলের মধ্যে কেবলমাত্র এখানেই এক সময় অল্পদিনের জন্য হলেও শীতকালে তুষারপাত হত। এখন আর হয় না।

আজ জন ও এমিলির ৬৭তম বিবাহ বার্ষিকী। ঐ ব্যাপারটি ছাড়াও আরও একটি কারণে সকালেই তার মনটা ভাল হয়ে গেল। রান্নাঘরের জানালার শার্টার তুলে দিতেই এমিলি দেখতে পেল যে, লম্বা ঢিলেঢোলা এক ধরণের প্রাচ্যদেশীয় জামা আর টুপি পরে তার প্রতিবেশী সাউথ আফ্রিকান ভদ্রলোক ও তার তিন স্কুল পড়ুয়া ছেলে মসজিদে যাচ্ছে, সম্ভবত প্রার্থনা করতে। এমিলি জানত যে, গত এক মাস ধরে ওদের রামাডান ফাস্টিং চলছিল। আজ সম্ভবতঃ ওরা রামাডান এন্ডিং ফেস্টিভাল পালন করছে। কি যেন একটা নাম রয়েছে ওদের এই ধর্মীয় উৎসবটির, এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না এমিলির। আজকাল অনেক কিছুই আর মনে থাকে না তার। বয়স তো আর কম হল না! তবে একটা বিষয় বেশ মনে আছে ওর। গত বছরের রামাডান এন্ডিং ফেস্টিভালের দিনটিতে ঐ সাউথ আফ্রিকান পরিবার কিছু খাবার এমিলিকে দিয়ে গিয়েছিল। বেশ সুস্বাদু ছিল বাসায় তৈরী করা সেই সব মিষ্টি, মাংস আর ফ্রায়েড রাইস। নিশ্চয় এবারও খাবার পাঠাবে তারা। গতবার আরেক প্রতিবেশী তো খাবার খাওয়ানোর জন্য এমিলিকে তাদের বাসাতে জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা বাংলাদেশের মানুষ, এমিলির বাসা থেকে একটু দূরে থাকে। যদিও এমিলি তেমন খেতেটেতে পারে না, কিন্তু উৎসবের দিন ওদের এই লোক খাওয়ানো আর সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানোর রেওয়াজটি তার ভালোই লাগে। হঠাৎ একটা ছোট্টো ব্যাপার মনে পড়ে যাওয়াতে একটু খটকা লাগল এমিলির, আচ্ছা, গত বছর তো তাদের বিয়ে বার্ষিকীর বেশ কিছু দিন পর এই রামাডান এন্ডিং উৎসবটি উদযাপিত হয়েছিল। কিন্তু এবার তা এতটা এগিয়ে এলো কি করে? অন্তত দশ বারো দিন এগিয়ে এসেছে তো বটেই। যাই হোক, কারণ নিশ্চয় একটা কিছু আছেই। জেনে নেয়া যাবে তা কোনো এক সময় ওদের কারো কাছ থেকে। বোধহয় চান্দ্রমাসের কোনো ব্যাপার-স্যাপার হবে। এসব জিনিস সহজে এমিলির মাথায় ঢোকে না। একবার তার স্বামী জন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে ঘটে, তা তাকে বোঝানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। যদ্দুর মনে পড়ে সেটি ছিল তাদের বিয়ের বছর তিনেক পরের কথা। ঘন্টা খানেক বৃথা চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে জন সেদিন বলেছিল, "তোমার মাথায় কাঁকড়ার সমান বুদ্ধিও নেই। তুমি মেয়ে না হয়ে ব্যাটাছেলে হলে আমার হাতে গাট্টা খেতে।" ওর সেই রাগ দেখে বিস্তর হেসেছিল এমিলি। সেই দিনটির কথা মনে পড়াতে এক ধরণের দুঃখ মেশানো আনন্দে এমিলির চোখে জল এসে যায়।

এমিলি বরাবরই ওরকম। এসব বৈজ্ঞানিক বা টেকনিক্যাল বিষয় সে খুব একটা ভাল বোঝে না। আজকালকার প্রজন্মের মানুষজন কত কিছু বোঝে, কত কিছু করতে পারে তারা, ভেবে ভেবে অবাক হয়ে যায় সে। এই কম্পিউটারের কথাই ধরা যাক। কি অদ্ভুতই না এই মেশিনটি! কতো কিছু করা যায় এটা দিয়ে। তারপর চালকবিহীন গাড়ীও নাকি বাজারে এসে গেছে। আবার রোবট দিয়ে নাকি এরপর সার্জিক্যাল অপারেশনও শুরু হবে শিগ্রী, সার্জন ডাক্তারের নাকি আর দরকার হবে না। কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? কে জানে! তার স্বামী জন যখন ২০০০ সালে মারা যায়, তখনো মোবাইল ফোনের তেমন ব্যবহার ছিল না। এখন এমিলির নিজের একটা মোবাইল ফোন রয়েছে বটে, তবে ওটা দিয়ে সে কোনো রকমে ফোন করা আর ফোন রিসিভ করার কাজটা চালিয়ে নিতে পারে। আর সেটা অনেকটা বাধ্য হয়েই সে তার ভাইপো টনির কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। তবে এমিলি টনির কাছে শুনেছে যে, তার এই ফোন দিয়ে নাকি ফটো তোলা, ভিডিও করা, মুভি দেখা, মিউজিক শোনা, অন্য লোকের ঠিকানা খোঁজা- এমনকি অনলাইন শপিংও করা যায়। জিজ্ঞেস করেছিল টনি, "শিখবে

নাকি আন্টি কীভাবে করে এসব?" এমিলি সাফ সাফ জবাব দেয় টনিকে, "নারে, এই বয়সে ওসব শিখে আর কাজ নেই আমার। ওগুলো তোদের জন্যই।" টনি হাসে, "তুমি চিরটা কাল সেই সেকেলেই রয়ে গেলে আন্টি। আজও ডেন্টিস্টকে বলো 'টুথ ডক্টর', পোডায়াট্রিস্টকে ডাকো 'ফুট ডক্টর' বলে।" লজ্জা পায় শার্লি। টনিকে দোষ দেয়া যায় না। সত্যি কথাই তো বলেছে সে। এইতো কদিন আগে তার ডায়াবেটিসের ব্যাপারে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল স্পেশালিস্টের সঙ্গে। তার আরেক ভাইপো ড্যানিয়েলকে ফোন করে এমিলি বলল, "আমাকে একটু শুগার ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবি?" ড্যানিয়েল তো আর বোঝে না কোন্ ডাক্তারের কথা বলছে তার আন্টি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে এমিলির কথা বুঝতে পেরেছে এবং তাকে নিয়েও গেছে নির্দিষ্ট ডাক্তারের কাছে।

টনির মেয়ে নিকি আরও এক কাঠি সরেস। একদিন সে এমিলিকে প্রস্তাব দিল, "গ্র্যান্ড আন্ট, এসো একটা ফেসবুক অ্যাকাউণ্ট খুলে দিই তোমার নামে। ভাল সময় কাটবে তোমার চ্যাটিং করে।" এমিলি চোখ তোলে কপালে, "সেটা আবার কি?" নিকির জবাব, "আগে খুলেই দিই না তোমাকে। তারপর দেখবে কি মজা!"
"না বাবা, ওসবের কোনো দরকার নেই। ঐ চ্যাটিং ফ্যাটিং-এ আমার পোষাবে না।"
"আচ্ছা, সারাদিন তুমি কি করে সময় কাটাও বলতো? সারা জীবনে একদিনের জন্যও ছেঁড়া-ফাটা সেক্সি জীন্স্ ট্রাউজার পরলে না। ঐ সামান্য একটু লিপস্টিক ছাড়া ভাল করে কখনো মেক-আপ পর্যন্ত নিলে না। পাক্কা হাফ সেঞ্চুরি ধরে একটি মাত্র বুড়ো হাবড়ার সাথেই কাটিয়ে দিলে। সেই বুড়োটাও তো কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে গেছে। এরপর বিয়েটিয়েও আর করলে না। আচ্ছা, বিয়ে না হয় আর নাইবা করলে, এক-আধটা বয় ফ্রেন্ডও তো রাখতে পারো?'
তারপর যৌবনদীপ্ত নিকি তার সুডৌল বুকে টোকা দিয়ে বলল, "এই আমাকে দ্যাখো, মাত্র সাত বছরে চারটা বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিভ টুগেদার করলাম। শিগ্রী পাঁচ নম্বরটাকে ধরতে যাচ্ছি।"
এমিলি প্রায় মারতে ওঠে নিকিকে, "ভাগ্ ছুঁড়ি তুই এখান থেকে! আমাকে খবরদার আর কক্ষনো এসব জ্ঞান দিতে আসবি না। যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।"
নিকি দৌড়ে এমিলির বাসার সামনে পার্ক করা তার টয়োটার দিকে যেতে যেতে বলে, "তোমার যে কি সব কাজ পড়ে রয়েছে, তা ভালই জানা আছে আমার। সারাদিন ধরে ঐ বুড়োটার ছবি ঝাড়পোঁচ করবে, আর ডায়াবেটিক ফ্রেন্ডলি পানসে স্যুপ বানিয়ে গিলবে- এই তো?"

আরেকদিনের কথা। টনি আর নিকি সেদিন একসাথে এমিলির বাসাতে বেড়াতে এসেছিল। কথায় কথায় টনি বলে বসল, "আন্ট এমিলি, তুমি তো খুবই সোজা সরল মানুষ। তবে একটা কথা বললে অন্যভাবে নিও না।" এমিলি বলল, "কি বলবি বল্। তোরা তো প্রায়ই আমাকে উপদেশ দিতে পছন্দ করিস।"
"ল্যাও ঠ্যালা, ভাল করে না শুনে আগেই মন খারাপ করে ফেললে?"
এমিলি সামান্য ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "যা বলার, বলে ফ্যাল্ না তাড়াতাড়ি।"
"না, বলছিলাম কি, তুমি যে যখন তখন ঐ বিদেশীগুলোর দেয়া খাবার মুখে দিয়ে ফেলো, এটা বোধ হয় ঠিক নয়।"
"কেন, অসুবিধা কি তাতে?"
টনি যুক্তি দেখায়, "বুঝলে না আন্টি, ওদের রেসিপি আমাদের শরীর গ্রহণ নাও করতে পারে।"
"তার মানে?"
"মানে খুবই সোজা। কে জানে কি দিয়ে তৈরী ওগুলো! তাই না খাওয়াই ভাল।"
"কেন, ওরা যদি ওসব খাবার খেয়ে না মরে, তবে আমি মরতে যাবো কোন্ দুঃখে? আর তা ছাড়া, আমি তো স্রেফ একটু মুখে দিই, ভাল করে গিলিও না।"
একটু নড়েচড়ে বসে টনি। উকিলের মতন গলা করে বলে, "একটুখানি মুখে দেয়াও যা, বেশী খাওয়াও তা।" এরপর ডাক্তারের গলাতে বলে, "আর তা ছাড়া এখানে মরামরির কথা আসছে কেন? কুখাদ্য খেয়ে তো আর কেউ মরে না, অসুখবিসুখে ভোগে। তার ওপর ধরো তোমার বয়সও তো কম হল না। ব্যাপার হল..."
ধমকে ওঠে এমিলি, "তুই থামবি? এসব নিয়ে তোদের কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওরা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। আর ভালবেসে যদি কিছু দেয় তারা, তা হলে সেটা কি আমার ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ?"
কাঁচুমাচু করে টনি, "আরে না না, ফিরিয়ে দিতে কে বলছে? কথা হল, না খেয়ে পরে এক সময় রাবিশ বিনে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অথবা কাকপক্ষীকে দিয়ে দিলেও চলে। ওরা তো বিষ খেয়েও হজম করে ফেলতে পারে।" তারপর

মিন্‌মিনে গলাতে বলে, "ব্যামো বাধালে ওরা কি আর তোমাকে দেখতে আসবে একটি বেলার জন্যও? তখন তো এই আমাদেরকেই ছোটাছুটি করতে হবে। তাই না?"

চুপ করে থাকে এমিলি। কি বলবে সে! কিন্তু হঠাৎ ওর পক্ষ নিয়ে নিকি ওকালতি শুরু করে, "বাবা, তুমি বোধ হয় একটু বেশীই বলে ফেললে। ফরেনারদের সঙ্গে কিন্তু আমার ঢের ওঠাবসা করতে হয়। আগে স্কুল ও ইউনিভার্সিটির জীবনে করতে হয়েছে, আর এখন সিটি কাউন্সিলের কাজেও করতে হচ্ছে। ওদের অধিকাংশই কিন্তু মানুষ হিসাবে খুবই ভাল।"
টনি এবারে একটু মন খারাপ করে বলে, "লে বাবা, আমি কি বলেছি যে, ওরা ভাল না? আমি শুধু ওদের খাবারের কথা বলছি।"
নিকি আবারও এমিলির পক্ষে ওকালতি করে, "ওদের খাবারও বেশ স্বাস্থ্যসম্মত। আমি তো অফিসে ওদের আনা খাবার প্রায়ই খাই। কই, ভালোই তো আছি।"
টনি এবার হাল ছেড়ে দেয়, "তোরা যে বুঝতেই পারলি না আমি কি বলতে চাইছি!"
নিকি বলে, "থাক, বুঝে কাজ নেই। চলো, এবারে যাই।"

অতঃপর টনি আর নিকি বিদায় নেয়। কি আর করা! দুই ভাইপো আর তাদের দেড় গন্ডা ছেলেমেয়ে ছাড়া আপন জন বলতে তো আর কেউ নেই এমিলির। বিপদে আপদে ওরাই এগিয়ে আসে। তাই ওদের একটু আধটু উপদেশ, টিপ্পনি কিংবা রসিকতা হজম করতে হয় তাকে। একা একা একটা মাঝারী আকারের তিন রুমের বাসায় থাকে এমিলি। আত্মীয়রা মাঝে মাঝে ঘুরে যায় ওর বাসা থেকে। ফোন করে খোঁজ খবর নেয়।

সকালের নাস্তা সেরে এমিলি তার বিয়ের ছবিগুলো নিয়ে বসে। সে আমলে তো আজকালকার মতন ছবি তোলার এত ধুম ছিল না! কিছু অন্যান্য স্মৃতির ছবির অ্যালবামও টেনে নেয় এমিলি। পুরাতন ছবিগুলো আবার নতুন করে দেখতে শুরু করে সে। এক দৃষ্টিতে জনের একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আহা, কি তারুণ্যে ভরা জনের চেহারা! এমিলির চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। এই ছবিটা তার সঙ্গে জনের পরিচয় হওয়ার ঠিক আগ দিয়ে তোলা। তখন জনের বয়স ছিল আটাশ বছর। বয়সে এমিলির চাইতে জন নয় বছরের বড় ছিল। পুরো নাম জন হপকিন্স।

১৯৫১ সালের জুন মাসের ষোলো তারিখে তাদের বিয়ে হয়। এমিলির বয়স তখন উনিশ বছর। তার ঠিক মাত্র এক মাস আগে ওদের দুজনের মধ্যে পরিচয় ঘটে জন্মদিনের এক পার্টিতে। এমিলির খালাতো বোন মেরীর জন্মদিনের পার্টি ছিল সেটি। মেরীই এমিলিকে জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এমিলি যেই মাত্র জানল যে, জন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন প্রাক্তন সৈনিক এবং নিউগিনির সালামাউয়াতে জাপানীদের বিরুদ্ধে সে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে, সেই মুহূর্তেই সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। যুদ্ধফেরত সৈন্যদের ব্যাপারে বরাবরই এমিলির ভীষণ আগ্রহ ছিল। সেই সময়টায় কুমারী মেয়েদের মধ্যে যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যদের সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তাই এমিলিই আগ বাড়িয়ে জনের সাথে কথা বলতে শুরু করল, "আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি মিঃ হপকিন্স। তো বলুন আমাকে নিউগিনির যুদ্ধে আপনার গৌরবময় অভিজ্ঞতার কথা।"
প্রত্যুত্তরে জন বলল, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমিও যারপরনাই খুশী হয়েছি মিস্ ব্যানফোর্ড।" এমিলির সারনেম ছিল তখন 'ব্যানফোর্ড'। পাঁচ সেকেন্ড বিরতি নিয়েই জন আবার বলতে শুরু করল, "যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এই অভিজ্ঞতা যতটা না গৌরবজনক, তারও চেয়ে ঢের বেশী বিচিত্র আর ভয়াবহ।"
"তো শুনিই না দু একটি অভিজ্ঞতার কথা।"
জন চারিদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "এখানকার এই পরিবেশে যুদ্ধের কেচ্ছা শুনবেন?" তারপর একটু ইতস্ততঃ করে যোগ করল, "তার চেয়ে চলুন না একদিন কোথাও বসে কফি খেতে খেতে গল্প করা যাক।"

এমিলি ঠিক এমনটাই চাইছিল। জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার এই তো সুযোগ! আর তা ছাড়া একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, তার ব্যাপারেও জনের আগ্রহ রয়েছে। এক অনাবিল আনন্দে এমিলির মনটা ভরে গেল। একটু পরেই নাচ শুরু হল। ফাস্ট মিউজিকের সাথে হাত ধরাধরি করে জোড়ায় জোড়ায় নাচ চলছিল। এমিলি জনকে নাচতে আহ্বান জানাল। কিন্তু সে শুধু একটু হাসল, নাচতে রাজী হল না।

তার ঠিক দুদিন বাদেই একটা ক্যাফেতে মুখোমুখি বসল তারা দুজন। জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই এমিলি ঝট করে ওয়েট্রেস ডেকে দুজনের জন্য দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ আর দুকাপ কফির অর্ডার দিয়ে ফেলল।

খাওয়া শেষে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে একমনে এমিলিকে দেখছিল জন। যেন ইচ্ছে করেই সব রকমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর লজ্জা শরমের পাটটা চুকিয়ে ফেলতে চাচ্ছিল সে। এই মেয়েটির নীচের ঠোঁটটা বেশ পুরু ও ঝোলানো। তা ছাড়া কিন্তু ওর বাদবাকী সবকিছুই সুন্দর। ঠোঁটটি ও-রকম ঝুলে না থাকলে এমিলিকে একশর মধ্যে একশই দেয়া যেত। আবার এটাও সত্যি যে, ওর ঝোলানো ঠোঁটটি ওর চেহারাতে এক ধরণের সরলতা এনে দিয়েছে। তা না হলে বোধহয় এমিলিকে খুব ধুরন্ধর গোছের একটা মেয়ের মতো দেখাত। সেটা কি ভাল হত? এই রকম সাত-পাঁচ ভাবছিল জন। এমিলি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেও ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। সেও জনের চেহারা নিয়ে ভাবছিল। লোকটাকে দেখতে তেমন সৈনিকের মতন লাগে না। বরং ওর আদলে কবি বা দার্শনিক ভাবটাই যেন বেশী প্রকট।

তবু আলাপন শুরু হওয়া দরকার- ভাবল এমিলি। আর যেন ওর মনের কথা টের পেয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই জন কথা বলতে আরম্ভ করল। তবে তার আগে এমিলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জন এবার দূরের এক পাহাড়ের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।
"আসলে যুদ্ধ জিনিসটা মোটেও অ্যাডভেঞ্চারাস নয়, রোমাঞ্চকর তো নয়ই। পুরো ব্যাপারটাই ভীষণভাবে বাজে, কুৎসিত আর অমানবিক। তবু আমরা যুদ্ধে যাই, যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হই, কিংবা গাজী হয়ে গর্বিত পদভরে বাড়ী ফিরে আসি। দেশকে, মানবতাকে রক্ষা করার জন্যও কখনো কখনো আমাদেরকে যুদ্ধে যেতে হয়।" যেন অনেক দূর থেকে জনের কথাগুলো ভেসে আসছিল। যেন এমিলির উদ্দেশ্যে নয়, নিজের মনেই জন একা একা কথাগুলো বলে চলেছিল।

এমিলি আপাতত কোনো ধরণের উচ্চবাচ্য না করার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ 'হ্যাঁ', 'না', 'আহা', 'উহু' গোছের শব্দগুলো এই ধরণের বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না। জন এক উদাস ভঙ্গীতে তার স্বগতোক্তি চালিয়ে গেল।
"সালামাউয়াতে আমাদেরকে এমন এক পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হয়েছে যে, শত্রুপক্ষের লোকেরা যেন হয়ে পড়েছিল একইসাথে একেবারে আমাদের লাগোয়া ও দূরবর্তী পড়শী। সকাল বিকেল দূরবীনে তীব্র দৃষ্টি হেনে চলত পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ। আর সেই সাথে ছিল ট্রেঞ্চ থেকে পরস্পরের প্রতি থেকে থেকে মেশিগান আর কামানের গোলাবর্ষণ। দাবা খেলা যেমন মাঝে মাঝে খুবই ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং উভয় দাবাড়ুই যেমন কখনো কখনো গুটি চালাতে দীর্ঘ সময় নিতে থাকে, অনেকটা সে রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের রণাঙ্গনের। আবার একে ঠিক 'রণাঙ্গন' বা 'যুদ্ধক্ষেত্র' না বলে 'রণবস্তি' বা 'যুদ্ধমহল্লা' আখ্যা দেয়াই বোধহয় বেশী সমীচীন হবে।"
তারপর খুবই অন্যমনষ্কভাবে জন একটা সিগারেট ধরাল। ও যে ধূমপায়ী, তা জানা ছিল না এমিলির। কারণ মেরীর বার্থ ডে পার্টিতে ওকে সিগারেট খেতে দেখেছে বলে মনে পড়ছে না এমিলির। যাই হোক, সুদীর্ঘ সময় নিয়ে জন একটু একটু করে পরিস্থিতি ও ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলল। কিভাবে আস্তে আস্তে তাদের খাবার ও পানীয় কমে আসছিল, আর ধীরে ধীরে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল মোট চারটি প্ল্যাটুনের প্রায় শ' দেড়েক সৈন্য, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। সব চেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল মশার উপদ্রব। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমিলি টের পেলো যে, জন আসলে আর তার সঙ্গে কথা বলছে না, আত্মনিমগ্ন হয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ থেকে যেন বিলাপ আর শোকগাথার সংমিশ্রণে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করে চলেছে মাত্র।

"একদিন হয়েছে কি, আমি আর প্রতিপক্ষের জাপানী এক সৈন্য একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম। রসদ ও গোলাবারুদ প্রায় ফুরিয়ে গেছে। জাপানীদের অবস্থাও তথৈঃবচ। দুই পক্ষের সৈন্যরাই ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সম্বল কেবল রাইফেলের হাতে গোণা কয়েকটি বুলেট, আর সেগুলো ফুরালে বেয়নেটের ব্যবহার। যাকে বলে একেবারে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ধরে নেয়া যাক, জাপানীটার নাম ছিল হারুতো। লোকটা একটা গাছের আড়ালে অবস্থান করছিল। আর আমি একটা ছোটো টিলার পেছনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যদিও আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নই, তবুও সেদিন কেন যেন আমার কেবলি মনে হচ্ছিল হারুতোকে আমি জন্ম-জন্মান্তর হতে চিনি। আমার তখনো কোনো বৌ-বাচ্চা নেই, কিন্তু হারুতোর হয়তো রয়েছে। কারণ ও আমার চেয়ে বেশী বয়স্ক ছিল। হারুতোর পরিবার হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যুদ্ধ শেষে আবার সবাই একত্রিত হবে- এই আশাতে তারা হয়তো দিন গুণছে।"

একটু থামল জন। ও যেন সামান্য হাসির মতন একটু শব্দ করল বলে এমিলির মনে হল। আবার জনের হাসির ব্যাপারটা এমিলির মনের ভুলও হতে পারে।
"...কিন্তু যুদ্ধ বলে কথা। যুদ্ধ তো আর এসব সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না!...
হারুতো ও আমি কেউ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনিও না, জানিও না। অথচ ঘটনাচক্রে ঐ মুহূর্তে কিভাবে যেন সেদিন আমি আর ঐ বোঁচা নাক আর ক্ষুদে চোখের জাপানীটা একে অপরের শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আমি ওকে মারতে সামান্যতম দ্বিধা করলে ও আমাকে মারবে। অপরদিকে মুহূর্তের জন্য ওর বিন্দুমাত্র দুর্বলতার সুযোগ পেলে আমি ওকে মেরে ফেলব। এদুটোর যে কোনো একটি ঘটতেই হবে, তৃতীয় কোনো পথ আমাদের সামনে সেদিন খোলা ছিল না।" শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটার গোড়া জুতায় পিষে ক্যাফেটোরিয়ার টেবিলে একটা অ্যাশ ট্রে থাকা সত্ত্বেও জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জন। তার চেহারা ক্রমশ যেন এক দুর্বিনীত মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল এবং তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল, এবার সে খুবই গুরত্বপূর্ণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছে। কিন্তু কার্যত জন তারপর একেবারেই চুপ মেরে গেল। মিনিটখানেক পর এমিলি প্রশ্ন করল, "তারপর কি হল?" কিন্তু পর মুহূর্তেই সে অনুধাবন করল প্রশ্নটা ভুল। জনের কথা আসলে শেষ হয়ে গেছে। তবে জন এমিলির প্রশ্নে একটুও অবাক কিংবা বিরক্ত হল না। এমনকি জনকে দেখে বোঝারও কোনো উপায় ছিল না আদৌ এমিলির প্রশ্নটা সে শুনতে পেয়েছে কিনা। একটু লজ্জা পেল এমিলি।

হঠাৎ জন আবার মুখ খুলল, "দেরী করে ফেললাম। চলো এমিলি, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।" যেন অনেক দূর থেকে জন আবার কাছে চলে এসেছে।
জনের মুখে 'মিস্ ব্যানফোর্ড'-এর বদলে শুধু 'এমিলি' ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাপারটার নতুনত্ব বা অস্বাভাবিকত্ব ধরতে পারেনি। এমিলির কাছে মনে হচ্ছিল এটাই তো স্বাভাবিক। একটু পরেই তার মনে পড়ে গেল, আরে, জন যে আমাকে শুধু 'এমিলি' বলে ডাকছে!

বাসায় ফেরার পথে এমিলি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না তারও জনকে 'মিস্টার হপকিন্স' না ডেকে শুধুমাত্র 'জন' বলে ডাকা ঠিক হবে কিনা। তবু স্রেফ নীরবতার বরফ গলানোর জন্যই জনের উদ্দেশ্যে অনেকটা মরিয়া হয়ে এমিলি বলে ফেলল, "দুঃখিত জন, যুদ্ধের সব মন খারাপ করা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য। এখন মনে হচ্ছে, অন্য কোনো হাল্কা বিষয়ে আলাপ করলেই বোধ হয় ভাল হত।"

হঠাৎ যেন প্রায় থেমে যাওয়া নৌকার পালে ভীষণভাবে হাওয়া লাগিয়ে জন হেসে উঠল, "হাল্কা বিষয়? আরে দূর। দ্যাখো দেখি মেয়ের কান্ড! কি বলে না বলে, তার কোনো হিসেব নেই! মোটেও আমি মন খারাপ করিনি। আসলে আমারই ও-রকম পাগলের মতো বিড়বিড় করে বকে যাওয়া উচিৎ হয়নি। আর এটাও তুমি ভেবে বোসো না যে, আমি একটা অকর্মণ্য ফিলোজোফার এবং যুদ্ধে যাওয়ার অনুপযুক্ত। আসলে তোমার সামনে ও-রকম একটা অদ্ভুত পরিবেশেই আমি ও-রকম সেন্টিমেন্টাল আর মিনমিনে বনে গিয়েছিলাম। তবে যুদ্ধের ময়দানে আমি কিন্তু খুবই দুর্ধর্ষ এক সৈনিক। বীরত্বের জন্য অনেক অ্যাওয়ার্ড-ম্যাওয়ার্ডও পেয়েছি। সব দেখাব তোমাকে একদিন।"

তারপর খুব বেশী দিন আর তাদের প্রাক-বৈবাহিক পূর্বরাগ চলেনি। এমিলি তার এক মাসের মধ্যেই 'মিস্ ব্যানফোর্ড' থেকে 'মিসেস হপকিন্স' হয়ে গেল। এই এক মাসে এমিলি অনেক কিছু জানল জন সম্বন্ধে। জনের বাবাও সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। জনের বয়স যখন মাত্র এগারো মাস, তখন তার মা অন্য একজন পুরুষের সাথে চলে যায়। জনের বাবার পোস্টিং ছিল তখন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে। জন তার দাদীমার কাছে মানুষ হয়েছে। আর একেবারে শৈশব থেকেই তারও আর্মিতে ঢোকার ইচ্ছে। কিন্তু জনের বাবার তাতে ঘোরতর আপত্তি। তাঁর ধারণা, আর্মির চাকুরীর কারণেই তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে এসেছে। তাই তিনি আর চাননি পুত্র জনের কপালেও একই ধরণের দুর্ভোগ নেমে আসুক।

কিন্তু জনও সেনাবাহিনীতে ঢোকার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়, আর জনও তরতাজা সাহসী এক তরুণ। বাবার শত আপত্তি উপেক্ষা করে সে অস্ট্রেলিয়ান আর্মিতে যোগ দেয় এবং তাকে একে একে প্রথমে ডারউইন

এবং তারপর নিউ গিনিতে যুদ্ধে পাঠানো হয়। যুদ্ধশেষে জন দেশে ফিরে আসে। সেটা ১৯৪৫ সালের কথা। এমিলির সাথে তার পরিচয় হওয়ারও পাঁচ ছয় বছর আগের ঘটনা।

জন আর এমিলির বিয়ের আগের সেই একটা মাস যেন উড়ে চলে গেল। জন প্রায়ই একটা কথা এমিলির কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলত, "ডার্লিং, বিয়ের পর কখনোই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?" এমিলি একদিন একটু ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলেই ফেলল, "আচ্ছা, তুমি প্রায়ই এই প্রশ্নটা আমাকে করো কেন বলোতো?"
জন বলল, "সরি এমিলি, যদিও আমার মায়ের কথা কিছুই মনে নেই এবং পরিণত বয়সেও তাঁকে আর কখনোই দেখিনি, তবু মা-বাবার দাম্পত্য জীবনের করুণ পরিণতির ব্যাপারটা প্রায়ই আমাকে নাড়া দিয়ে যায়।"

বিয়ের রাতে সব অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নেবার পর বাসর ঘরে নববধূ ও বর মুখোমুখি হল। জনের মুখাবয়বে আস্তে আস্তে এক অদ্ভুত ধরণের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। ও যেন ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছিল না। এমিলি তার তৃতীয় ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিবেশের অস্বাভাবিকতাটা টের পেয়ে গেল। ও সোজা সরল মেয়ে হলেও বোকা নয় মোটেও। জনকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কিছু বলতে চাও জন?" যেন চমকে উঠল জন। যেন কেঁপে কেঁপে উঠল তার গলার স্বর, "ইয়ে, এমিলি, তুমি তো আর কখনো জানতে চাইলে না সেই হারুতোর শেষ পর্যন্ত কি হল?" এমিলির বুঝতে কিছু সময় লাগল কার কথা বলছে জন। তারপর বলল সে, "এদ্দিন পর হঠাৎ ঐ জাপানী সৈন্যটার কথা তুললে কেন বলোতো আমাদের বিয়ের সুন্দর এই রাতে? আমি তো জানিই ও তোমার হাতে গুলী খেয়ে..." বাধা দেয় জন তাকে, "সে তো বুঝলাম যে, তুমি বুঝেই ফেলেছ তার কি পরিণতি হয়েছিল। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ যে, ও আমাকে সেদিন শুধু শুধু ছেড়ে দিয়েছিল?" খুব অবাক হয় এমিলি জনের কথায়, "কেন, কি করেছে হারুতো তোমার?" ধীরে ধীরে জন বলে, "মরার আগে ঐ জাপানীটা আমার বাম পাটা কেড়ে নিয়েছে।" ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে এমিলি। জনের বাম পায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আর্তনাদ করে ওঠে সে, "তোমার বাম পা ও কেড়ে নিয়েছে? তার মানে??" এতক্ষণ পর জনের দ্বিধা আর ভয়টা যেন অনেকটা উবে যায়। যেন তেমন কিছুই হয়নি। যেন কোনো এক ছিনতাইকারী জনের হাতের থলেটা কেড়ে নিয়েছে মাত্র, এরকম একটা ভাব করে জন বলল, "সেদিন হঠাৎ মাথার ওপর জাপানী বোমারু বিমান এয়ার রেইড শুরু করে। পরিস্থিতিগত কারণে এক সময় আমাকে ও হারুতোকে খোলা মাঠে নামতে হয়। আমরা একই সঙ্গে পরস্পরকে ফায়ার করি, হারুতোর বুলেট লাগে আমার বাম পায়ে, আর আমারটা সোজা গিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে...।" একটু থেমেই আবার জন বলতে আরম্ভ করে, "জাপানী সৈন্যটার বুলেটের আঘাতে আমার বাম পা এতটাই জখম হয় যে, শেষ পর্যন্ত তা অ্যাম্পুটেট করতে হয় এবং মাস ছয়েক পরে তার বদলে একটা কৃত্রিম প্রস্থেটিক পা লাগাতে হয়।" জনের কথা শেষ হতেই এমিলি বাসর ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুট দিল। আর ঐ কৃত্রিম পা নিয়ে জনও ছুটল ওর পিছু পিছু, "এমিলি, আমি তোমাকে কথাটা অনেক বারই বলতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত বলতে পারিনি। বিশ্বাস কর ডার্লিং। আই লাভ ইউ।... একটু থামো এমিলি। প্লীজ। এভাবে দৌড়াতে থাকলে পড়ে যাবে যে!"- চেঁচাতে থাকে জন।
এমিলি থামল না। দৌড়াতে দৌড়াতেই ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "শাট আপ ইউ হিপোক্র্যাট! এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা তুমি আমায় এতদিন বলোনি! তুমি একটা ভন্ড!!" আর ঠিক তার পরপরই সে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় বিয়ের ভারী কাপড়-চোপড় সমেত মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং জ্ঞান হারাল।

ওদের বিয়ের আগের ঐ এক মাসে জনের চলাফেরা আর ওঠাবসা দেখে একবারও কিন্তু এমিলির কোন রকম সন্দেহ হয়নি যে, জনের এরকম একটা শারীরিক খুঁত রয়েছে। এমনকি জন চমৎকার গাড়ীও চালাতে পারত। তার কৃত্রিম বাম পা দিয়ে যেরকম নিখুঁত ভাবে সে ক্লাচ অপারেট করত, তা দেখে বোঝার সাধ্য ছিল না যে, তার ঐ পা আসল পা নয়। তবে বিয়ের রাতের সেই দুর্ঘটনার পর এমিলি যখন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছিল, তখন স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে একদিন হঠাৎ একটা বিষয় তার কাছে পরিষ্কার হল কেন তার খালাতো বোন মেরীর বার্থ ডে পার্টিতে জন তার সঙ্গে নাচতে রাজী হয়নি।

যাই হোক, যদিও এমিলি প্রচন্ড জোরে আছড়ে পড়েছিল, কিন্তু কেবল নরম মাটির কারণে সে যাত্রা ও রক্ষা পেল। তবে শারীরিক আঘাতটা সামলে উঠলেও মানসিক ভাবে সে ভাল রকমই ঘায়েল হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা নভেলের মতো শোনালেও সত্যি যে, পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরে জনের একটানা সেবা ও আন্তরিক সঙ্গদানের ফলে এমিলির প্রায় সকল

মানসিক ক্লেদ দূর হয়ে গেল। একজোড়া কপোত-কপোতীর মতো বাক-বাকুম করতে করতে তাদের নতুন দাম্পত্য জীবন শুরু হল।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেবার পর জন পুরাতন মোটরগাড়ী ও জাহাজ ডিমোলিশনের ট্রেনিং নেয়। আর তার বাকী জীবন কাটে এই গাড়ী ও জাহাজ ভাঙ্গার পেশাতেই। না, এমিলি কখনোই তাদের অর্ধ শতাব্দীর দাম্পত্য জীবনে একদিনের জন্যও জনকে ছেড়ে কোথাও যায়নি। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় এমিলির কোল আলো করে তাদের সংসারে এসেছিল আদরের একমাত্র পুত্র-সন্তান এরিক। কিন্তু মাত্র সাত বছর বয়সে সে মেনিঞ্জাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আর কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি এমিলি ও জনের।

অশ্রুসজল চোখে অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে আবারও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় এমিলি। অনেক আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায় তার। তাদের সন্তান এরিকের তখনো জন্ম হয়নি। এমিলি ও জন গ্রিফিথে গিয়েছিল জনের এক বন্ধু গ্রাহামের খামারবাড়িতে কদিনের জন্য বেড়াতে। গ্রিফিথ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ কিলোমিটার পথ ভেঙ্গে সিডনী ফিরে আসার পথে জনের ভীষণ ইচ্ছে হল আইসক্রীম খাওয়ার। বিশেষ করে 'কোন্ আইসক্রীম' খেতে জন খুব পছন্দ করত এবং ঐ বস্তুটি সে নিয়মিত ভক্ষণ করত। গ্রাহামের ওখানে যত্ন আত্যির কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু আইসক্রীমের অভাবে জন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেই আমলেও রাস্তার ধারে অনেক পেট্রোল স্টেশন ছিল বটে, তবে তারা সবাই সাধারণ আইসক্রীম রাখত- ঐ 'কোন্ আইস্ক্রীম' রাখার চল তেমন ছিল না তখন। এমিলি কখনোই গাড়ী চালানো শেখেনি। তাই বরাবরের মতন সেদিনও জন একাই ড্রাইভ করছিল। ওদিকে দুজনের পানির তেষ্টাও পেয়ে গেল খুব। তাড়াহুড়োর মধ্যে ভুলবশত খুব বেশী খাবার পানি নেয়া হয়নি সঙ্গে। দোকান থেকে কেনা সফ্‌ট ড্রিঙ্কও তারা কখনোই খেত না। সিডনী ফিরতে তখনো ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগবে। জন রাস্তার ধারে গাড়ী থামাল। দুজনেই নির্বাক আর অসহায়। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি এমিলিকে গ্রাস করল। তার স্পষ্ট মনে হল যে, সে এই জায়গাটা চেনে এবং এখান থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে বাস্তবে কোন্ আইস্ক্রীমের মামুলী দোকান নয়- আস্ত একটা ফ্যাক্টরিই রয়েছে। কিন্তু ঐ জায়গাটি সিডনী যাওয়ার পথে পড়বে না- মেইন রোড থেকে বেরিয়ে অনেকটা ভেতরে যেতে হবে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, এমিলি নিশ্চিত ছিল যে, সে সেই গাড়ী থামানোর জায়গা থেকে ঐ আইস্ক্রীম ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার রাস্তাটা চেনে। জনকে কথাটা বলতেই সে একটু অবাক হলেও ওখানে যেতে রাজী হয়ে গেল। সে শুধু এমিলিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি নিশ্চিত যে, আমাকে পথ দেখিয়ে আইস্ক্রীম ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতে পারবে?" এমিলি কেবল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, মুখে কিছুই বলল না।

মানুষের জীবনে সত্যিই একেকটা সময় আসে, যা ব্যাখ্যার অতীত। এমিলি কখনোই তেমন ধার্মিক বা স্পিরিচুয়াল নয় বা অতীতেও ছিল না। তবে সে আবার নাস্তিকও নয়। সে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর এই দৃশ্যমান জীবনই শেষ কিছু নয়, এরকম অসংখ্য বিশ্ব আর তথাকার অসংখ্য জীবন ও জীবনাচরণ রয়েছে। কিন্তু সেদিন যা ঘটল, তা আজীবন তার মনে থাকবে। সেদিন সে সেই আইস্ক্রীম ফ্যাক্টরি পর্যন্ত সেই প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা জনকে অক্লেশে দেখিয়ে নিয়ে গেল। পথে অনেক চড়াই উৎরাই এবং ডানে, বামে বা সোজা যাওয়ার ব্যাপার ছিল। অথচ এমিলি একটিবারের জন্যও থমকায়নি কিংবা দ্বিধান্বিত হয়নি। আইস্ক্রীম ফ্যাক্টরি থেকে একই ভাবে মূল রাস্তায় ফিরে আসার সময়ও এমিলি ছিল যেন একজন দুর্ধর্ষ জীবন্ত পথ নির্দেশিকা। আপ-ডাউন সর্বসাকুল্যে এই পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তার বাইরে আর কিছুই তার চেনা ছিল না। সিডনীগামী মেইন রোডে ফিরে আসার পর জন শুধু এমিলিকে জিজ্ঞেস করল, "এর আগে কবে তুমি গিয়েছিলে ওখানে?" এমিলি জনকে সত্যি কথাটাই বলল, "না, এর আগে আর কখনোই আমি ওখানে যাইনি।" জন জানত যে, এমিলি কখনোই মিথ্যা কথা বলে না। অথচ তবুও সেদিন সে ঐ একটি দিনের জন্য হলেও এমিলির সত্যবাদিতা নিয়ে মনে মনে হয়তো সন্দেহ করেছিল। মুখে কেবল সে বলেছিল, "স্ট্রেঞ্জ!"

হঠাৎ এরিকের পাঁচ বছর বয়সের একটি সাদাকালো ছবিতে এমিলির দৃষ্টি আটকে যায়। বেঁচে থাকলে এখন ওর বয়স হত বাষট্টি বছর।
"বাছা তুই কেমন আছিস, কোথায় আছিস? তুই এখন দেখতে কেমন হয়েছিস? তোদের ওখানে মানুষের বয়স কি বাড়ে? তোর বাবার সঙ্গে তোর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না? ও কি যুদ্ধে হারানো পাখানা নতুন করে ফিরে পেয়েছে? ঐ জগতে তোর বাবা কি সেই হারুতোর দেখা পেয়েছে কখনো? ওরা কি পরস্পরকে ক্ষমা করে দিয়েছে?"

এরিকের ফটোতে পাগলের মতো চুমু দিতে দিতে প্রলাপ বকতে থাকে এমিলি। চোখের জলে ছবিটা ভিজে যেতে থাকে।